ছড়ানো মুক্তা

মহারাণী আর পুঁচকে রাজা

সীরাত পাবলিকেশন

2020-03-31 11:26:14 +0600 +0600

10 MIN READ

জীবনের বাঁকে বাঁকে থাকা এক চোরাফাঁদের নাম তারাফ।

শব্দটি বিভিন্ন রূপে আটবার উল্লেখিত হয়েছে কুরআনে, প্রতিবারই নেতিবাচক অর্থে (দেখুন ১১:১১৬, ১৭:১৬, ২১:১৩, ২৩:৩৩,৬৪, ৩৪:৩৪, ৪৩:২৩ এবং ৫৬:৪৫)। আভিধানিক অর্থে তারাফ মানে "প্রাচুর্য", "সহজতা", "বিলাসিতা", "কোমলতা"। বৈশ্বিক পর্যায়ে তারাফের নোংরা দিকটি বুঝতে একটি তথ্যই যথেষ্ট। বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে উৎপাদিত খাদ্যের সাত ভাগের ছয় ভাগ ভোগ করে। বাকি অর্ধেক জনগোষ্ঠী পায় বাকি এক-সপ্তমাংশ।

তারাফের বিপরীত "খুশুনাহ"। এর অর্থ "কঠোরতা", "কর্কশতা", "কাঠিন্য"।

আলি ইবনু আবি তালিব (রাঃ) এ দুটি জিনিসের তুলনা করে বলেছেন যে, তারাফে অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে যা কর্কশ, খুশুনায় অভ্যস্তদের কাছে তা মসৃণ। তবে এটা আপেক্ষিক। একেকজনের খুশুনাহ সহ্য করার ক্ষমতা একেকরকম। বনি ইসরাঈলের কাছ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারা একজন রাজা চেয়েছিল। কিন্তু যখন তাদের দাবি পূরণ করা হলো, "অল্প কয়েকজন ছাড়া তাদের সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিল..." (২:২৪৬)। নদী পার হওয়ার সময় তার সংখ্যা গেল আরো কমে। অনেকেই বলল, "জালুত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু করার সামর্থ্যই নেই।" (২:২৪৯) এমনকি বাকি যাদের পূর্ণ ইয়াকিন ছিল, তাদের মাঝ থেকেও মাত্র একজন এগিয়ে এসেছিল জালুতকে হত্যা করতে। সেই একজন হলেন নবি দাউদ আলাইহিসসালাম।

যৌবনে এভাবে খুশুনাহ সহ্য করে বাকি জীবন দাউদ এক দিন পরপর রোযা রাখেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একে "সর্বশ্রেষ্ঠ সিয়াম" আখ্যা দিয়েছেন। [এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, একদিন পরপর সিয়াম রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ সিয়াম হলে মুহাম্মাদ ﷺ নিজে কেন সেটা করলেন না? তিনি কখনও একটানা অনেক দিন সিয়াম রাখতেন, কখনও একটানা অনেকদিন সিয়াম রাখতেন না, শা'বান মাসে এবং সোম ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম রাখতেন। ইবনু রজব লিখেছেন, "দাউদ আলাইহিসসালামের সিয়ামকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ হলো তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় সিয়াম পালনে কেটেছে। মুহাম্মাদ ﷺ এর সিয়ামগুলো যোগ করলে সেগুলোও তাঁর জীবনের অর্ধেক বা তারচেয়ে বেশি হবে। কিন্তু একদিন পরপর রাখার বদলে তিনি বেশি ফযিলতের দিনগুলো বেছে বেছে রোযা রাখতেন।"]

নবিজি ﷺ এর মৃত্যুর সময় গোটা আরব উপদ্বীপ ছিল তাঁর কর্তৃত্বাধীনে। ওদিকে পারস্য আর রোমান সম্রাটও তাঁর ভয়ে কম্পমান। অথচ মৃত্যুকালে তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল স্রেফ তিনটি জিনিস: একটি সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র এবং দান করে যাওয়া এক টুকরো জমি। তাঁর জীবনযাপনও ছিল মরণকালের মতোই খুশুনায় ভরা। আনাস (রাঃ) বলেন, "পরেরদিনের জন্য সঞ্চয় করার মতো কিছুই আল্লাহর রাসূলের কাছে থাকত না।" আরো বলেছেন, "আল্লাহর সাথে দেখা করার আগ পর্যন্ত জীবনে কখনও নবিজি ﷺ পাতলা রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।" আইশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহর ঘরে কখনও কখনও একটানা দুই মাসও চুলা জ্বলেনি।" হাসান আল-বাসরি বলেছেন, "বাচ্চাকালেই আমি রাসূলুল্লাহর ঘরের ছাদ নাগাল পেতাম।" উমর (রাঃ) বলেন, "আমি মাথা তুলে তাঁর ঘরের চারপাশটা দেখলাম। আল্লাহর কসম, সেখানে তিনটে চামড়ার পাত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে আপনার উম্মাহর জন্য আরো কিছু চান। পারস্য আর রোমকে তো তিনি কতকিছুই দিলেন, তারা তো আল্লাহর ইবাদাতও করে না।' তিনি উঠে বসে বললেন, 'খাত্তাবের ছেলে! তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে? ওইসব জাতির সব প্রাপ্য এই দুনিয়াতেই শেষ হয়ে গেছে।'"
যা চাই, তা-ই পেতে নেই – এ শিক্ষা নবিজি ﷺ উমরকে দিয়ে গেছেন।

কয়েক বছর পর উমর (রাঃ) একবার জাবির (রাঃ) এর হাতে এক টুকরো মাংস দেখে জিজ্ঞেস করেন, “জাবির, ওটা আবার কেন?” জাবির বললেন, “এই একটু মাংস খেতে ইচ্ছে করল, তাই।” উমর অবাক হয়ে বললেন, “যেটা ইচ্ছে করে, সেটাই কিনে ফেল বুঝি?” উমর বলছেন না যে, মাংস খাওয়া হারাম। বরং তিনি জাবিরকে তা-ই শেখাচ্ছেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শিখিয়ে গেছেন – যা মনে চায়, তা পেতে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করা। রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ যে প্রচণ্ড খুশুনাময় জীবন কাটাতেন, সে স্মৃতি তিনি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন:

* জাবির (রাঃ) নিজেই সে সময়ের ব্যাপারে বলেছেন, “আমাদের কারো কাছেই এক সেটের চেয়ে বেশি কাপড় ছিল না।”

* আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আওফা (রাঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যাওয়া সাতটি যুদ্ধে তিনি এবং আমরা পঙ্গপাল খেয়ে দিন কাটিয়েছি।”

* আবু মূসা আল-আশআরি (রাঃ) বলেছেন, “আমরা একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সঙ্গে যুদ্ধে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পায়ের মাংস ছিলে যাচ্ছিল। আমার তো বুড়ো আঙুলের নখই পড়ে যায়।”

* নবি ﷺ এর পেছনে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আসহাবে সুফফার কিছু সাহাবি ক্ষুধার জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। বেদুঈনরা এঁদের দেখে পাগল ভাবত। নবিজি পরে তাঁদের কাছে গিয়ে বলেছেন, “আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কী প্রতিদান আছে, তা জানলে তোমরা আরো গরীব হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে।”

* আসহাবে সুফফার বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, “আমি সত্তরজন আহলুস সুফফাকে দেখেছি। তাঁদের একজনেরও চাদর ছিল না। হয় একটি ইযার আর নইলে অন্য কোনো কাপড় তাঁরা গলায় বেঁধে রাখতেন। বড়জোর পায়ের গোছা বা হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছত সেগুলো।”

আবু হুরায়রা নিজেও ছিলেন আসহাবে সুফফার একজন। কিন্তু সেটা তাঁর স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া সিদ্ধান্ত। কারণ মদিনায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি ও প্রচুর টাকা ছিল। কিন্তু তিনি বেছে নেন খুশুনার জীবন। এমনকি তিনি বলেন, “নবিজি ﷺ এর মিম্বার আর আইশার কক্ষের মাঝখানে আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকতাম। পাগল ভেবে মানুষ আমার ঘাড়ে পাড়া দিত। অথচ আমি তো পাগল ছিলাম না, ছিলাম ক্ষুধার জ্বালায় কাতর।”

একবার ত্রিশ হাজার সাহাবি রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে তাবুকের শত মাইল উত্তরে এক অভিযানে বের হন। সাথে থাকা সামান্য খাবার অল্প দিনেই ফুরিয়ে যায়। উমর (রাঃ) বলেন, “প্রচণ্ড দাবদাহের মাঝে আমরা তাবুকে রওনা হই। এক জায়গায় আমাদের এতটা তেষ্টা পায় যে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। কেউ কেউ তো নিজের উট জবাই করে তার পেট থেকে পানি বের করে মুখে দিচ্ছিল।” কাতাদা বলেন, “আমরা শুনেছি দুজন মানুষ একটি খেজুর ভাগ করে খেতেন। কখনও একজন একটি খেজুর চুষে একটু পানি মুখে দিতেন, এরপর আরেকজনকে একই খেজুর চুষতে দিতেন।” অবশেষে তাবুকে পৌঁছে তাঁরা বিশ দিন যাবত রোমানদের অপেক্ষায় থাকেন। অথচ তাদের টিকিটিরও দেখা নেই। ফিরে যাবার বদলে সাহাবিরা শাম পার হয়ে রোমানদের ভূমিতেই তাঁদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। একসময় খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ এর (রাঃ) বাহিনী হানা দেন আশপাশে রোমানদের মিত্র গোত্রগুলোতে। আক্রমণে পরাজিত হয়ে তারা জিযইয়া দিতে স্বীকৃতি জানায়। এমনই এক গোত্রের নেতা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সেই সাদা খচ্চরটি উপহার দেন, যা আমৃত্যু তাঁর মালিকানায় থাকে। সাহাবিরা তাবুক ছেড়ে যাওয়ার সময় ততদিনে আরব উপদ্বীপের পুরো উত্তর সীমান্ত ইসলামি রাষ্ট্রের কবজায়। প্রচণ্ড গরম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিয়ে শত শত মাইল পাড়ি দেওয়ার ক্লান্তি সত্ত্বেও তাঁরা এই বিশাল অর্জন নিয়ে ফেরেন। খুশুনার এমনই বরকত।

এবার এর সাথে তুলনা করুন আন্দালুসের পতনকে। সাতশ বছর মুসলিম শাসনাধীনে থাকা এ অঞ্চলকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছিল তারাফ। বিশাল এলাকা ছোট হতে হতে শুধু গ্রানাডা বাকি থাকে। দ্বাদশ মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তি ছিল এর শাসক। সে এতই লোভী যে, নিজ পিতার বিরদ্ধে সে ক্যাথলিকদের সাথে আঁতাত করে। ফার্ডিনান্ড আর ইসাবেলার কাছে তার প্রয়োজন

ফুরিয়ে গেলে তাকেও তারা ক্ষমতাচ্যুত করে। পরেরদিন সে দূর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এর চূড়ায় সদম্ভে উড়ছিল ক্যাস্টাইল এবং মুরহন্তা সেন্ট জেমসের পতাকা। ফার্ডিনান্ড যেখানে ইসাবেলার সাথে দাঁড়ানো ছিল, সেখান পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সে গ্রানাডার চাবি তুলে দেয় ফার্ডিনান্ডের হাতে (যা সে পরে ইসাবেলার হাতে দেয়)। তারপর বিখ্যাত এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাহনে চড়ে দ্বাদশ মুহাম্মাদ চলে যায় নির্বাসনে। এই বিশ্বাসঘাতকের এত সাহায্য পেয়েও স্প্যানিশ খ্রিষ্টানরা ব্যাঙ্গ করে তার নাম দেয় el rey chico, পুঁচকে রাজা। তারাফের এমনই অভিশাপ।

আন্দালুসের পতনের আগেই ইবনু খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমা গ্রন্থে লিখেছেন, "রাজ্যপতনের একটি কারণ হলো তারাফ ও ভোগবিলাসের ফাঁদে পড়ে যাওয়া।" বইয়ের একাধিক অধ্যায়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারাফ কীভাবে মানুষকে বস্তুবাদী, নরম ও ভীতু করে তোলে।

তারাফের সাথে শারীরিক দুর্বলতার সম্পর্কও দেখান তিনি। লিখেছেন, "একই শহরের বাসিন্দাদের মাঝেও তারাফের ভিত্তিতে পার্থক্য থাকে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে – শহুরে কি গ্রাম্য – ভোগবিলাসে অভ্যস্ত লোকেরাই আগে মারা পড়ে।"

আরো দেখিয়েছেন তারাফের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক। লিখেছেন, "নগরায়ণের আরেকটি দিক হলো তারাফের আতিশয্যে কামে লিপ্ত হওয়া। নানা উপায়ে পেটের ক্ষুধা মেটানোর হাত ধরে আসে যৌনক্ষুধা মেটানোর নানা উপায়, যেমন ব্যভিচার ও সমকাম। ঘনিয়ে আসে মানবজাতির ধ্বংস।"

সাত ভাগের ছয়ভাগ খাদ্যভোগী জনগোষ্ঠীর মাঝে যেহেতু পশ্চিমা মুসলিমরাও পড়ে, তাই ইবনু খালদুন-বর্ণিত সামাজিক ব্যাধিগুলো আমাদের মাঝেও মহামারি আকারে রয়েছে।

অপরদিকে খুশুনার সাথে শারীরিক সামর্থ্যের সম্পর্কদেখিয়ে ইবনু খালদুন লিখেছেন, "দেখবেন যে, প্রাচুর্যে ভরা এলাকার লোকদের তুলনায় ভুখা-নাঙ্গা যাযাবরদের শারীরিক শক্তি অনেক বেশি। তাদের ত্বক আর দেহ পরিষ্কার, গঠন আকর্ষণীয়, আচরণ উত্তম আর মেধা প্রখর।"

ঈমানের সাথেও খুশুনার সম্পর্কদেখিয়েছেন তিন, "যারা ক্ষুধা ও কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছে – সে যাযাবর হোক বা শহুরে – ধর্মকর্মে তারা বেশি অগ্রসর। সত্যি বলতে, শহুরে এলাকায় ধার্মিকরা সংখ্যালঘু। কারণ অতিভোজন ও বিলাসিতার ফলে অন্তর কঠিন ও উদাসীন হয়ে পড়ে।"

সর্বোপরি ইবনু হাজার লিখেছেন, "সালাফদের অনেকেই অল্পে তুষ্ট থাকতেন। এতে আখিরাতে প্রাপ্যও বাড়ে, হিসাবও সহজ হয়।"

এসকল কারণে ওই মানুষগুলো মনমতো জিনিস পেয়ে যাওয়ার বিষয়টাকেই অপছন্দ করতেন। মনে হতে পারে যে, আজকের যুগে ওসব আদিকালের আলাপ করে লাভ নেই। কিন্তু এখনও এমন মানুষ পাওয়া যায়, যারা শাশ্বত এই মূল্যবোধ ধারণ করেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ১৯শে মার্চ, ২০১৯ সংখ্যায় একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। কালো কাপড়ে ঢাকা এক যুবতীর, নাম উম্মে আব্দুর রহমান। সিরিয়ার বাগুয অঞ্চলের একজন রাণী তিনি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে তিনি বলেন, "এত ক্ষুধা ও বোমা হামলার মাঝেও আমরা শান্তিতে আছি।" এ যেন আলি (রাঃ) এর সেই উক্তির প্রতিধ্বনি, "তারাফপন্থিদের কাছে যা কঠিন, খুশুনাহ অবলম্বনকারীদের কাছে তা খুবই সহজ।"

যুহদ ও খুশুনাময় জীবন শুরু করার এক চমৎকার উপলক্ষ রমাদান। ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমেই শুরু হতে পারে তা: তোশক সরিয়ে শক্ত জায়গায় শোয়ার অভ্যাস করুন, অথবা দিনে একবেলা খান (নবি ﷺ এর এক সহীহ হাদীসে এই নির্দেশ আছে), অথবা ঘর থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস ঝেঁটিয়ে বিদেয় করুন। সীমা মেনে চললে খুশুনায় কোনো কষ্ট হবে না। বরং আরো শক্তিশালী হবেন। সাইয়িদ কুতুব লিখেছেন, "আল্লাহ মুমিনদের কষ্ট দিতে ফিতনা ও পরীক্ষায় ফেলেন না। বরং এর মাধ্যমে তিনি তাদের আমানত বহনের জন্য প্রস্তুত করেন। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি লাভ হয় কঠিন পরিস্থিতি

মোকাবেলা করার মাধ্যমে। আল্লাহর সাহায্য ও পুরস্কারের প্রতি সত্যিকারের আস্থা রেখে ধৈর্য ধরে ব্যথা সইতে হয়। ফিতনার রাত যত দীর্ঘই হোক বা পরীক্ষা হোক যতই কঠিন, কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে অন্তর বিগলিত হয়। মনের ময়লা দূরীভূত হয় ছাইচাপা আগুন বেরিয়ে আসে। আত্মাকে কঠিকভাবে আঘাত করে জং সরিয়ে শক্তিশালী ও চকচকে করে তোলে এসব পরীক্ষা। জামা'আহর ওপরও কঠিন পরিস্থিতির একই প্রভাব। দৃঢ়তম মেরুদণ্ড, মজবুততম চেতনা, ও আল্লাহর সাথে গভীরতম সম্পর্কধারী লোকেরা ছাড়া বাকি সবাই ঝরে পড়ে। বাকি থাকা অল্প কিছু লোকই আল্লাহ তাআলার দুই প্রতিজ্ঞার প্রতি আস্থাশীল: হয় শাহাদাহ, না হয় বিজয়। এই লোকগুলোই পতাকা তুলে নেবেন শেষ পর্যন্ত আমানত বহন করে চলবেন...”

তারিক মেহান্না
রবিবার, ১৬ই শাবান, ১৪৪০ (২১শে এপ্রিল, ২০১৯)